Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-IV, April 2017, Page No. 58-69
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মঙ্গলকাব্যে উল্লেখ্য অন্ত্যজশ্রেণির পেশাগত পরিচয়

সাগর সরকার
গবেষক, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, বিহার, ভারত

Abstract:

"Mangalkavya" is a character gallery of low professional people. Various Mangalkavas contain detailed descriptions of the life, livelihood, reforms and culture of this lower class. The mirror of literary society. In the eminent medieval genre Mangalkavya, the way of life of these lower caste people has been described in detail by the authors of various professions for subsistence. Livelihood requires food, clothing and shelter and the means by which we collect the essentials of life is called livelihood. The lower class people of the society whose only recourse is manual labor are the only social friends and by their actions they help to advance the wheel of the chariot of the society. From ancient times the classification of society was based on work . It can be said that his work or livelihood was his family identity or his own identity. The people associated with the lower castes of the society were "Shudras" i.e. their only job was to serve the higher society. In the poem "Manasamangal" it is seen that Goddess Manasa wanted to be established in the higher society by preaching worship to the lower society. So the fisherman, who made a living with nets, ropes and boats, resorted to Jalu-Malu. Catching snakes, selling amulets, amulets, Ojha scholarships, whose only occupation is the detailed description of the "Vede" race through the character of the Shankar Ojha, a friend of Chand Sadagar. In the poem "Chandimangal" the hunter of wild animals sells his meat at the market and makes a living saw through Kalketu & Fullara.In the poem "Dharmamangal", the people of the Dom community make a living by rearing ducks, chickens and pigs made of bamboo products. Dharmamangal Kavya also has images of women practicing prostitution through the characters of Suraksha, Guriksha and Bhajan Buri. "Shivayan" also has images of Coach ladies tempting Shiva. "Shivayan" portrays the coach nation. He used to make a living by farming. In the poem "Annadamangal" there is a story about the Patni people who make a living by crossing the ferry. His image is portrayed through Ishwari Patni. All these lower castes have maintained their way of life by earning a meager living in an unhealthy environment and living in abject poverty.In this article, the lower class of the lower class mentioned in "Mangalkavya" has been explored with an exploratory aspect of the livelihood of each tribe.

Keywords- Bacward class, livelihood, Mangalkavya, lower class society, community.

জীবনধারণের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রয়োজন আর যার মাধ্যমে আমরা জীবনের অপরিহার্য উপকরণ গুলো সংগ্রহ করি তাকেই জীবিকা বলে। সোজা কথায় যার মাধ্যমে আমরা অর্থ উপার্জন করি তাই হল। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি হল বৃত্তি বা পেশা। অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য কোন না কোন বৃত্তি অবলম্বন করেছে এবং এখনো করছে। আদিম মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হল তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল বিভিন্ন বৃত্তি ধারণ। জীবন যাত্রারমান উন্নত করতে শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতার ফলেই মানুষ হয়েই উঠল আরো উন্নত ও শুরু হলো উৎপাদন কেন্দ্রিক বাণিজ্যিকীকরণ। উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা লাভ করল। তখন আর এই বৃত্তি বিশেষ কোনো মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েই রইল না হয়ে উঠলো বহু মানুষের জীবন যাপনের মাধ্যম।এক এক বৃত্তি কে অবলম্বন করে গড়ে উঠলো এক এক গোষ্ঠীর বা জাতির পরিচয়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য গুলিতে বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পর্কের সুনিপুণ পরিচয় তুলে ধরেছেন মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারার বিভিন্ন কবিগণ।

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজে চতুর্বর্ণ প্রথা ছিল। তাদের কর্ম সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি অবগত আছি। তবে শেষ বর্ণ ছিল শূদ্র। এই অধ্যায়ের শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত বিভিন্ন অন্ত্যজ শ্রেণির পেশা মঙ্গলকাব্যের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হবে এবং বর্তমানে তারা কি ধরনের পেশা অবলম্বন করেছে সেদিকটিকেও অবগত করা হবে। শূদ্র বর্ণটি অনুলোম- প্রতিলোম বিবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন শংকর জাতির সৃষ্টি করেছিল। 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' মতে সমাজের বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষ ছত্রিশটি জাতি গঠনে করল এই বিভাজন মূলত তাদের কর্মগত ভিত্তিক। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে গুজরাট নগর পত্তন অংশটি সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের জীবন - জীবিকা সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র নিম্নবর্গীয়দের জীবিকার প্রসঙ্গ নেই আছে উচ্চশ্রেণির বর্ণহিন্দুদের জীবিকা গত পরিচয়। কিভাবে তারা তাদের সংসার নির্বাহ করতো তৎকালীন সময়ে তার একটি বাস্তবনিষ্ঠ পরিচয় কবি লিপিবদ্ধ করেছেন। উচ্চবর্ণের বর্ণ হিন্দু ব্রাহ্মণদের একাংশ যারা নিজেদের কুলীন বলে গর্ব করতেন তারা বহু বিবাহকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বাধ্য হয়ে প্রচুর বরপণ দিয়ে মেয়েকে বিদায় করতেন। বৈশ্য বলে বিবেচিতরা ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন, কৃষিকাজকে তারা বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অন্ত্যজ শ্রেণির অন্তর্গত যেমন তেলি জাতি ঘানিতে শস্য পেশাই করে তেল বের করে ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। তাম্বুলী বা বারুইরা পান চাষ করে, কুম্ভকাররা মৃৎপাত্র বা মাটির তৈরি মূর্তি নির্মাণ করে, তাঁতিরা তাঁত বুনে, নাপিতের ক্ষৌরকর্ম করে, মোদক বা ময়রারা মিষ্টান্ন দ্রব্য তৈরি করে, স্বর্ণকাররা সোনার গহনা নির্মাণ করে, শঙ্খ বেনেরা শঙ্খ জাত দ্রব্য তৈরি করে, ধীবররা মাছ ধরে ও খেয়া পারাপার করে, ভাটেরা ভিক্ষা করে, চন্ডালেরা লবণ তৈরি করে, হাঁড়িরা ঘাস কেটে, চামাড়েরা পশুর চামড়া জাতীয় দ্রব্য তৈরি করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতো। তাদের জীবন জীবিকা জানাতে সাহিত্য গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে। সমাজের সঙ্গে সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। আর জীবিকার উপরিই জাতির অর্থনৈতিক - সামাজিক মানদণ্ড নির্ভর করে। ব্রাত্য জনের কথা অতি সুনিপুন ভাবে সাহিত্যে যতটা বলা সম্ভব অন্য কোন বিষয়ে তা সম্ভব নয়। কারন সাহিত্যে ঐতিহাসিক সত্য ও কল্পনা শক্তির মিস্রন ঘটিয়ে সাহিত্যিক আপন সৃজনশীল মৌলিক প্রতিভা বলে সরস সাহিত্যে গুণান্বিত করে তোলেন যা সহজে পাঠকের উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যই একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে লেখক অন্ত্যজদের সাথে মানুষের যোগসূত্র স্থাপন করে দিতে পারেন। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলে মানবতাবোধের জাগরন ঘটাতে পারেন। প্রাশ্চাত্য সাহিত্য ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সাহিত্যের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে অন্ত্যজদের কাছে। বাইরের সমাজ,

সংস্কৃতি, জীবন যাপন প্রনালী জান্তে চাইলে সাহিত্য বিশেষ সাহায্য করে। তাই বলা যায় উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণির মানুষের জীবনে সাহিত্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল কাব্য ' টিতে যে সমস্ত যুদ্ধ সৈন্যদের উল্লেখ করেছেন তারা বেশিরভাগই সমাজের নিচু তলার মানুষ। তারা কেউ পদাতিক সেনা, কেউঅশ্বারোহী ও গজারোহী, আবার কেউ বন্দুকধারী সৈন্য। রাজসৈন্য হিসাবে তারা নিজেকে নিযুক্ত করে জীবিকা নির্বাহ করতো। মাহাতরা হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ করত। পাইকড়া ছিল মূলত পদাতিক সৈন্য। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বিভিন্ন বৃত্তির অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ।

রায়গুনাকার ভারতচন্দ্র রায় তার "অন্নদামঙ্গল কাব্যে" ও বিভিন্ন বৃত্তিচারী মানুষের উল্লেখ রয়েছে। রাজকর্মচারীরা কেউ মুন্সিগিরি, কেউঘড়িয়াল ও পেশকার, এ রকমই বহু কাজে তারা নিযুক্ত থাকতেন। রাজকর্মচারীরা ছিল রাজার আজ্ঞাবাহী দাস। এছাড়াও রাজার আনন্দ দানের জন্য ছিলেন সঙ্গীতকার, গায়েন নর্তক-নর্তকী, মৃদঙ্গী এরা মূলত নিম্নবর্গীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলেই মনে হয়। তারা রাজা-মহারাজা ও জমিদারের মনোরঞ্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

আর এক শ্রেণির বৃত্তিচারী মানুষ ছিল বর্তমানের দৃষ্টি ভঙ্গিতে তারা মূলত বুদ্ধিজীবী। এঁরা সাহিত্য সাধনার মধ্যে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। মধ্যযুগের বেশিরভাগ কবিই কোনো রাজা বা বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সাহিত্য সাধনাই ছিল তাদের একমাত্র বৃত্তি। তাই বলা যেতে পারে মধ্যযুগে জীবিকা নির্বাহের জন্য রাজকর্মচারী, যোদ্ধৃ বেশ ধারী রাজসৈন্য, দাস-দাসী বৃত্তি, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি, স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পকুশলতা পরিচয় দিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যকে মাধ্যম করে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতো। তাদের কর্মচাঞ্চল্যের যে ধারা তা আজও বয়ে চলেছে। তবে বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসার, বর্তমান মানুষের বৃত্তিগত ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই বর্তমান নির্দিষ্ট কোন বৃত্তি নির্দিষ্ট কোন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ নয় তা হয়ে উঠেছে সার্বজনীন।

মানব সভ্যতা সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরে বেরিয়েছে। গোষ্ঠী কেন্দ্রিক জীবন থেকে মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনে পদার্পণ করেছে। মানুষ যত উন্নত হয়েছে ততোই নিজেদের মধ্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই যে মানুষ প্রথমে পশু শিকারি ছিল অরণ্যচারী জীবন অবলম্বন করত ধীরে ধীরে তারা কৃষিভিত্তিক জীবনে পদার্পণ করল। এর আরোও পরে হস্তশিল্পের দিকে একধাপ এগিয়ে অবশেষে যন্ত্রচালিত শিল্পের মধ্য দিয়ে আধুনিক বিচিত্রমুখী জীবিকায় পদার্পণ করল। মানবজীবনের এই যে দীর্ঘ পথচলা তার মধ্যে রয়েছে নানা উত্থান-পতন ও সংমিশ্রন। বিচ্ছিন্ন আদিম মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হল নিজ প্রয়োজনে শুরু হল এক গোষ্ঠীরটির মধ্যে অন্য গোষ্ঠীর বিনিময় প্রথা, অন্য গোষ্ঠীকে প্রধানত করে উন্নত হওয়ার প্রচেষ্টা। সভ্যতার বিকাশ ঘটলো আরও একধাপ। পশুপালন থেকে কৃষিকাজ, কৃষিকাজ থেকে ব্যবসা বাণিজ্য, তা থেকে হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের মধ্য দিয়ে একশ্রেণির মানুষ উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠলো। শুরু হলো অন্যকে পদানত করার মানসিকতা ও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস। সমাজে নির্দিষ্ট হয়ে গেল কার কোন কাজ ও কে কিভাবে জীবিকা নির্ভর করবে। শ্রেণি বিভাজনের সবথেকে বেশি বঞ্চিত হল শুদ্রশ্রেণি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন শ্রেণির সেবা করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। শূদ্র থেকেই বিভিন্ন সংকর জাতি সৃষ্টি হল। যারা বর্তমানে পরিচিত হলেন অন্ত্যজ শ্রেণির হিসাবে। তাদের এই

শ্রেণিবিভাজন মূলত কর্মভিত্তিক। তাদের নিজ নিজ কর্ম দ্বারা মানব সভ্যতাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। উচ্চ সমাজ তাদেরকে নেটিভ, আন্ত্যজ শ্রেণি, ইতর জাতি, অসভ্য বর্বর জাতি বলে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তাদের কায়িক শ্রমের উপরই নির্ভর করে মানব সভ্যতা।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সাহিত্যিক তাদের সাহিত্যে এই অন্ত্যজ শ্রেণির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। চর্যাপদে যে সমস্ত অন্ত্যজ শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে তারা কৃষিকাজ, মৎস্য শিকার, নৌকাচালনা, বাঁশের তৈরি ঝুড়ি, ডালি প্রভৃতি প্রস্তুত করে জীবিকা নির্বাহ করে ছিল। চর্যাপদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের কোন স্থান নেই। তাই তাদের জীবন-জীবিকা চর্যাপদে আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি। চর্যাপদ অন্ত্যজশ্রেণির গ্রন্থ। তাই তাদের জীবন ও জীবিকা এর পদবাচ্য বিষয় নয় । এখানে জেলেরা দড়া - জাল দিয়ে মৎস্য শিকার করে। ডোমেরা গ্রামের বাইরে বাঁশের তৈরি চাঙ্গাড়ি তৈরি করে। শুড়িরা চোলাই মদ তৈরি করে।

"এক সে সুন্ডিনি দুই ঘরে সান্ধ্যঅ।
চীঅন বাকলঅ বারুনি বান্ধাঅ।।"

তাঁতিরা তুলো ধুনে, কাঠুরেরা কাঠ ফেড়ে, ব্যাধ, শবর জাতি বন্য পশু শিকার করে, জীবিকা নির্বাহ করতো। তাঁতিদের তাঁত বোনার চিত্রটি নিম্নোক্ত পদটিতে তুলে ধরা হয়েছে ২৬ নম্বর পদে।

"তুলা ধুনি ধুনি আঁসুরে আসু"

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যিক নিদর্শন থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত যে পুরুষের সাথে নারীরাও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সংসার পরিচালনার হাল ধরত। "চর্যাপদে", "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে", (রাধা দধি হাটে বিক্রি প্রসঙ্গ) "চন্ডীমঙ্গল কাব্যে" (ব্যাধ কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরার হাটে মাংস বিক্রি প্রসঙ্গ) এছাড়াও মনসামঙ্গল কাব্যে, ধর্মমঙ্গল কাব্যে একাধিক প্রমাণ রয়েছে স্বামীদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীরাও ঘরে-বাইরে জীবিকা নির্বাহ হেতু বিভিন্ন কাজে হাত লাগাত।

একটি সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নতি প্রধানত তার উৎপাদন ক্ষমতা ও বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের শ্রমের ওপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ওরা কাজ করে 'কবিতায় মানুষের কর্মের প্রবাহের ধারাটি যে নিত্য বহুমান সেই দিকটি তুলে ধরেছেন। সমাজ সভ্যতা দেশের উন্নতি যাদের অবদানে পুষ্ট তারা হলেন খেটেখাওয়া নিম্নবৃত্তচারী সাধারণ মানুষ। এঁরাই সভ্যতার উন্নয়নের কান্ডারী। সমাজ বদলায় বদলায় ইতিহাস তুবুও শ্রমজীবী মানুষের বদলায়না অবস্থা। মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর সাহিত্যে বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের কর্মচাঞ্চল্যের উজ্জ্বল উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ভিন্ন মাত্রা দান করে। কবিরা তাই তাদের কাব্যে দেবদেবীর কথা বলতে গিয়ে নিম্ন বৃত্তিচারী মানুষের কথা বলে ফেলেছেন। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন দেবদেবীগনও বিভিন্ন বৃত্তিচারী মানুষের রূপ ধারণ করে কার্যসাধন করার চেষ্টা করেছেন। আবার 'শিবায়ন'বা 'শিবমঙ্গলে' শিবের চরিত্রটি কৃষিজীবী বাংলার এক কৃষকের চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন কবিরা। দেবী মনসা নিজেও মালিনী, গোয়ালিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন উত্তরণ ঘটল সামাজিক জীবনে। তারপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধারণা ও কর্মের বিভাজন থেকে মানুষের মধ্যে মানুষের বিভাজন সৃষ্টি হল। তৈরি হলো বর্ণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। বর্নগত, গুণগত, ও কর্মগত দিক থেকে একেবারে সমাজে নিচে পড়ে রইল শূদ্র জাতি। সমাজে অন্ত্যজশ্রেণি নিম্ন বিত্তচারী মানুষের সংখ্যাই বেশি।দেবী মনসা তাই উপলব্ধি করেছিলেন মর্তে পূজা পেতে হলে নিম্ন বৃত্তচারী মানুষের কাছে তার সমর্থন পাওয়াটা একান্ত জরুরি। তাই দেবী মনসা গোপ জাতির কাছে প্রথম নিজ পূজা কামনা করেছিলেন। যা সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ গরুত্বপূর্ন। আর এই মনসার দ্বন্দ্ব যেন অন্ত্যজ দের

আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা দ্বন্দ্ব যা সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবেও গুরুত্বপূর্ন। দেবী মনসা গোয়ালিনীর ছদ্মবেশ ধারণ নগরে দধি বিক্রির মধ্যে দিয়ে গোয়ালা জাতির জীবিকা নির্বাহের দিকটি ফুটে উঠেছে।

"দধির পসরা লয়্যা শঙ্খিনী নগরে গিয়া
মনসা বুলেন ঘরে ঘরে।
যেই মত মূল্য করে উচিত নাহিক ধরে
গোয়ালিনী বাড়ায়বিস্তর।।
গোয়ালিনী ডাক্যাকই আমার অমৃত দই
একখানি এক এক কাহন।
ভাঙ্গাচুরা বেচি নাই সব দধি একু ঠাঁই
মূল্য করি লবে কোন জন।।" (১)

দেবী মনসার মালিনী ছদ্মবেশ ধারণের মধ্যে দিয়ে পুষ্প চয়ন, পুষ্প পরিচর্যা, দেবতার পুষ্প জোগানোর মধ্যে দিয়ে মালী জাতির জীবিকা গত দিকটি ফুঁটে উঠেছে।

বাংলা নদীমাতৃক দেশ। নদীর সঙ্গে বয়ে চলে একশ্রেণির মানুষের জীবন-জীবিকা। তাঁরা হলেন জেলে সম্প্রদায়। তারা কেউ মৎস্য শিকার করে , কেউ সওদাগরে নৌকায় মাঝি বৃত্তি করে। মনসামঙ্গলের উল্লেখ রয়েছে জালু-মালু নামে দুই ভাই যারা জাতে জেলে। তারা সামান্য জাল-দড়া নিয়ে মাছ ধরে। তাদের জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন জেলে সম্প্রদায়ের আর্থিক দুরাবস্থার চিত্রটি স্পষ্ট প্রকটিত হয়ে উঠেছে। অনেক জেলে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে চাঁদ সদাগরের নৌকায় মাঝি মোল্লার বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। এই শ্রেণির মানুষ সহজ সরল জীবন যাপন করে। তাই দেবীর অযাচিত দেওয়া ধনকে উপেক্ষা করে তারা কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর বৃত্তিকেই স্থায়ী সম্পদ মনে করে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের নিশ্চিত উপায় বলে মনে করেছে। তারা জীবন ও বৃত্তিকে ভালবাসে তাই দেবীর প্ররোচনায় শিকার হতে চায় না। তাই জালু -মালু মাকে বলেছে-

"জালু বলে ধন প্রান লবে চাঁদ বান্য।
বারায় কি কাজ মিছে পেল নিয়া টান্যা।।"

অর্থাৎ কায়িক শ্রমজীবী মানুষ অল্পতেই খুশি। তাদের ধনবৃদ্ধি উচ্চশ্রেণির ঈর্ষার কারণ। জালু- মালু জানে তার ধন যেমন করেই হোক 'লবে চাঁদ বান্য'। বেহুলার স্বর্গারোহন নদী যাত্রাপথে বিভিন্ন জাতির মানুষের সাক্ষাৎ ঘটেছে। তা থেকে আমরা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারী মানুষের জীবন জীবিকা সম্পর্কে অবগত হতে পারি। গোদারা জাল দড়ি বরশি নিয়ে মৎস্য শিকার করে-

"গোদা যথা মৎস্য ধরে ঘাটেতে বসিয়া
তথায় বেহুলা আইল ভাসিয়া।।" (২)

ভারতচন্দ্রের' অন্নদামঙ্গল কাব্যে 'দেখেছি জাতিতে পাটনী তারা গঙ্গায় তরী বেয়ে নিত্যযাত্রীদের খেয়া পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করেছে।

'অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে। পার কর বলিয়া ডাকিল পাটুনিরে।।
সেই ঘাটে খেয়া দেয়ায় ঈশ্বরী পাটনী। ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি'।। (৩)

ঘটক বৃত্তি সঙ্গে নিযুক্ত কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায় যুক্ত না থাকলেও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্ণ অন্ত্যজ উভয়ই এই বৃত্তি অবলম্বন করে সংসার নির্ভর করেছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী দেখা গেছে ব্রাহ্মন পুরোহিত সোমাই পন্ডিত কালকেতু বিবাহের ঘটকালি করেছেন-

"সপ্তম পুরুষে মোর তুমি পুরোহিত। দেবতার সমান বুঝি তোমার চরিত।
পুত্রের বিবাহিত হেতু করি অভিলাষ। কিরাত নগরে কর কন্যার তল্লাশ।।"[৪]

ঘটকালি বাবদ তার বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছে-

"পণ্ডা গুয়া দিব গুঁড় পাঁচ সের। / ইহা দিলে আর কিছু না করিবে ফের।"[৫]

অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষার ফলে কৌম গোষ্ঠীতে আবদ্ধ মানুষ ঝাড়ফুঁক-তুকতাকে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে আর এসবই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। এ সমস্তই আন্ত্যজদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। তাদের সম্পর্কে জানতে হলে, তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে সাহিত্যের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। সর্প ধরা, সর্প নিয়েই খেলা দেখানো, সর্প বিষ সংগ্রহ করা, গ্রামগঞ্জে সাপে কাটা মানুষকে প্রানে বাঁচাতে পারে বলে মানুষের মধ্যে ভ্রমসৃষ্টি করে মাদুলি তাবিজ বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করে এক শ্রেণির মানুষ যারা বেদে জাতি হিসেবে পরিচিত। এরা পাহাড়ি অঞ্চলে ও বনে জঙ্গলে বসবাস করে। মনসামঙ্গল কাব্যে এই বেদে জাতি উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্প বিদ্বেষী জাতি বেদে কিন্তু তাদের জীবিকা ওঝা বৃত্তি। চাঁদ সদাগার পরম মিত্র ধন্বন্তরী। পেশা ওঝা বৃত্তি। বর্তমানে এ জাতিটি পূর্বের মত মানুষের আদরণীয় নয় কারণ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রভূত উন্নতি তাই আধুনিক মানুষ বৈদ্য-কবিরাজ ও বেদে জাতির উপরে ভরসা করো না। তাই সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে অতিদ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকেই উপযুক্ত মনে করে।

একাধিক মঙ্গলকাব্যে অন্ত্যজ শ্রেণির নর- নারীদের দাসীবৃত্তি করার উল্লেখ রয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যে নফর ধনা, অন্নদামঙ্গল কাব্যে- এর অন্তর্গত কালিকা মঙ্গলে বিদ্যার সহচরী হীরা মালিনী, চন্ডীমঙ্গল কাব্যে লহনার দাসী দুর্বলা, ধর্মমঙ্গল কাব্যের লাউসেনের দাস কালু ডোম, এরকম আরো অনেকেই ছিলেন প্রভুর আজ্ঞাবাহী দাস। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই বৃত্তিটি টিকে রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে ততদিন এই বৃত্তি টিকে থাকবে।'দাস-দাসী' এই শব্দটির পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু শব্দটির অর্থ পরিবর্তন হয়নি। এর পরিবর্তে এখন অনেকে ব্যবহার করে থাকেন পরিচারিকা, কাজের সহায়ক লোক এরকম অনেক শব্দ।

অরণ্যচারী পশু শিকারি, বন্যপ্রাণী শিকার, তার পশম, খড়ক, দন্ত, বাঘছাল, চামড়া, সিঙ্গা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহকারী জাতি হল ব্যাধ। তারা শিকার করা মাংস হাটে বিক্রি করে দিনপাত করে থাকে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী তে উল্লেখ্য ব্যাধ কালকেতুর মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতির জীবিকাটি চিত্রিত।

'অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল'।

সারাদিনের শিকার করা পশুর বিভিন্ন অঙ্গ বিক্রির জন্য পৌঁছানো হয় হাটে।

'চুপড়ি মেলয়ে দন্ত বেচে ফুল্লরা[৬]

বা

"ফুল্লরা পসার করে নগর চাতরে ।/হাঁড়িয়া চামর বেচে চারি পণ দরে।"[৯]

চন্ডীমঙ্গল কাব্য টিতে নিম্নবর্গীয় বৃত্তিজীবী মানুষের ভিড়ে ঠাসা। "গোপ প্রভৃতি জাতির আগমন" ও "ধীবর প্রভৃতি অনন্য জাতির আগমন" পাঠান্তর গুলোতে সমাজের যত নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষ রয়েছে তাদের উপস্থিতি ও জীবিকাগত পরিচয় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যা সমাজ তাত্ত্বিকদের পাশাপাশি তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক তথা গবেষকদের আশাতীত পরিতৃপ্ত করেছেন। মঙ্গলকাব্যে যতগুলি জাতি উপজাতির তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে তারা প্রত্যেককেই জীবিকাগত তথা আর্থিকগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া জাতি। এই অধ্যায় তাদের জীবিকা গত পূর্বের ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে।

প্রথমেই আসা যাক ডোম সম্প্রদায়ের কথায়। অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাদের জীবিকা গত অবস্থার কখনো উন্নতি হয়েছে আবার কখনো অবনতি হয়েছে। মধ্যযুগে ধর্মমঙ্গলকাব্যে উল্লেখ পাই তাদের জীবিকাটি ছিল সামরিক সেনাবাহিনীর কাজে যুক্ত। সেখানে কালু ডোম নিযুক্ত হয়েছ লাউ সেনের সেনাপতির হিসাবে। তবে তাদের জীবিকা ছিল বাঁশের তৈরি দ্রব্য যথা কুলা, চালনা, ডালা, চাটাই, মাছ ধরার খলই, পলো, তালপাতা খেজুরের পাতা দিয়ে তৈরি মাদুর, বিভিন্ন সৌখিনদ্রব্য। তারা ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য পূর্ণ জাতি ও যুদ্ধে পারদর্শী। 'আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে' প্রচলিত পংক্তিটি প্রমাণ করে তাদের সম্মানের সঙ্গে উপস্থিতি। সমাজ -অর্থনৈতিক ও শাসকের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবিকারও পরিবর্তন ঘটে গেছে। বর্তমানে ডোমরা বংশানুক্রমে বাঁশের তৈরি নানা রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের জীবিকা সম্পর্কে কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বলেছেন-

"বিয়নী চালুনি ঝাঁটা ডোম করে টোকা ছাতা
জীবিকার হেতু এক চিতে।"(৭)

রুপরাম চক্রবতী ধর্মমঙ্গল কাব্যের পশু পালান চিত্রটি তুলে ধরেছেন-

"ধর্মের শাসন মহী ময়না নগর । জাতি অনুসারে ডোম নিলেক শূকর।।" (৮)

সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে হাঁড়ি জাতিটি মর্যাদাহীন নিম্ন বৃত্তিজীবী। এরা মূলত দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে উল্লেখ রয়েছে তারা মনিবের গৃহ পালিত পশুদের জন্য ঘাস কাটত এছাড়াও তা হাটে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতো-

"বাহিরে বসি হাঁড়ি ঘাস কাটি লয় কড়ি
শুন্ডির অঙ্গনে যার মেলা।" (৯)

বর্তমানে চন্ডাল অসভ্য ম্লেচ্ছ জাতিটি ডোম জাতিরই সমকক্ষ। এক সময় শাসকের নির্দেশে অপরাধীকে মশানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করত। আবার কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে উল্লেখ রয়েছে তারা লবণ উৎপন্ন করত এবং বিভিন্ন ফল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো-

"চন্ডাল বসিয়া পুরে লবণ বিক্রি করে
পানিফল কেসর সংসারে।" (১০)

বাগদি জাতি মধ্যযুগে তারা ছিল বীর যোদ্ধা জাত। চন্ডীমঙ্গল ও ধর্ম মঙ্গল কাব্যে উল্লেখ রয়েছে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের মত বীর বিক্রমে প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করতেন-

"মুরারী বাগদি সাজে যমের সমান। / ধনুকে চামর বান্ধা রাজার নিশান।।"(১১)

রাজার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে রাজাদের আজ্ঞাবাহী দাস হয়ে কাজ করতেন বিনিময়ে সামান্য পারিশ্রমিক পেতেন। চন্ডীমঙ্গলে উল্লেখ রয়েছে তারা ছিলেন দুধর্ষ লাঠিয়াল। এটাই ছিল তাদের পেশা। তারা জমিদার মহাজনের অধীনে কর্মে নিয়োজিত হত এবং মনিবের ইশারাতে কাজ করত-

"বাগদি বসিল পুরে নানাবিধ অস্ত্র ধরে
দশ-বিষ পাইক করি সঙ্গে।"(১২)

মাটির পাত্র মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে সভ্যতা সৃষ্টিলগ্ন থেকে একশ্রেণির জাতি জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করেছে। তারা পরিচিত কুমার, কুমোর, কুম্ভকার এরকম বিভিন্ন নামে। এক মন্ড মাটিকে চাকার উপর বসিয়ে হতের অপূর্ব কলাকৌশলে হাড়ি কলসি তৈরি করে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করেছিল। আধুনিক সভ্যতার বিকাশ সত্ত্বেও কুমোর জাতির অবদান এখনো প্রাসঙ্গিক। চন্ডীমঙ্গলে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি সে কথাই স্মরণ করায়।

"কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়িকুড়ি গড়ে পেটে
মৃদঙ্গ দগড়ি গড়ে কড়া।" (১৩)

বাংলার আদিম অধিবাসীদের অন্যতম কিরাত জাতি। তারা মূলত পার্বত্য এলাকায় বসবাস করে। তারা যেহেতু অরণ্যচারী তাই পশু শিকার করা, হিমালায় তথা পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন পশুর চর্ম, পশম, চামরি গাই, মৃগনাভি, বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ সংগ্রহ করে সমতলের মানুষদের কাছে তা বিক্রি করাই এদের পেশা। মধ্যযুগের ভিন্ন মঙ্গলকাব্যে উল্লেখ রয়েছে যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে নিজেদেরকে যোগদান করত। বর্তমানে পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দা হওয়াতে চা শ্রমিকের কাজও করে থাকে । কবিকঙ্কণ চন্ডীমঙ্গলে উল্লেখ পাই তারা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েও জীবিকা নির্বাহ করতো-

'নিবসে কিরাত কোল হাটে বাজায় ঢোল' (১৪)

মৃত পশুর ছাল ছাড়িয়ে পাকা করে তা দিয়ে বাদ্যযন্ত্রের ছাউনী, জুতো, ঘোড়ার জিন, ব্যাগ, ধরনের চামড়ার দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে, বিভিন্ন গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জুতো ব্যাগ সেলাই করে জীবিকা নির্বাহকারী জাতিটি চামার নামে অভিহিত।

অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলাতে এক সুপ্রসিদ্ধ হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির মানুষ জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে এসেছে তারা 'নবশাখ' শাখার অন্তর্গত তন্তুবায় বা তাঁতি। তাদের হাতে তৈরি বস্ত্র প্রাচীনকাল থেকেই সুদূর পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানি হয়ে বঙ্গের তাঁতিদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। তাঁতিদের হাতের তৈরি কাপড়ে বহু বিদেশী বণিকরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পর্তুগিজ, ফরাসি ও ইংরেজ। তন্তুবায় সম্প্রদায় মূলত বস্ত্র বয়ন করেই জীবিকা নির্বাহ করত। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পলু পোকাও তুত চাষ করে তা থেকে রেশম সুতা তৈরি করে আমদানি ও রপ্তানি মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো। প্রাচীনকাল থেকেই কার্পাস জাত সুতা থেকে মসলিনের সুক্ষ্ম রেশমি কাপড় বিদেশে রপ্তানি করে বাংলার তাঁতিরা আর্থিক দিক দিয়ে অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। বাংলা সমাজের এক বৃহৎ অংশ তাঁতিরা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই পেশাটির সঙ্গে অনেকেই অনেকভাবে যুক্ত কেউ গুলটিনা, মখমলে, এবং অন্যান্য প্যাটার্নের রেশমী বস্ত্রপ্রস্তুত করতো। আবার কেউ কেউ সুতো রং করত, কাঁচামাল সংগ্রহ করত, আবার উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে ও স্থানীয় বাজারে রপ্তানি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। মধ্যযুগ পর্যন্ত এই তাঁতিদের হস্তচালিত তাঁত মর্যদার সঙ্গীটিকে ছিল। কিন্তু সুচতুর ইংরেজ বণিক বৈদেশিক বস্ত্র ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য বাংলা তাঁতিদের চিরপ্রসিদ্ধ তাঁত শিল্পের ওপর আঘাত হানে। নানা আইন-কানুনের

মধ্যে দিয়ে তাঁতিদের জীবিকা উপার্জনের হাতিয়ার চিরপ্রসিদ্ধ তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করে। এমনকি তারা যাতে তাঁত চালাতে না পারে তার জন্য তাদের বৃদ্ধাঙ্গুলটি কেটে দেওয়া হয়। এরপর ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটার পর বাংলার বহুল প্রচলিত তাঁতশিল্প পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রাচীনকাল থেকে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করে, অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করে, কর্মকাররা জীবিকা নির্বাহ করতো। তাই তাদের রাজা বাদশাহদের কাছে বিশেষ খ্যাতি ছিল। দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস হাল কোদাল, নিরনি ইত্যাদি তৈরি করে। এছাড়াও তারা চিত্রাঙ্কন স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পেও অনন্যসাধারণ শিল্পসম্ভাবের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে নতুন সংকর ধাতু দ্বারা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র তৈরি, যন্ত্রপাতি তৈরি, এছাড়া হাতা, খুন্তি, দা এর মত মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতো তার উল্লেখ কবিকঙ্কণ চণ্ডী তে রয়েছে-

"কামার পাতিয়া শাল কোড়ালী কোদাল ফাল
গড়ে টাঙ্গি যমধার শাল।" (১৫)

বস্ত্র ধৌতকরনকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন এক শ্রেণির মানুষ যারা ধোবা হিসাবে অভিহিত। পূর্বে তারা মূলত উচ্চবর্ণের বস্ত্র ধুয়ে থাকে। বৃত্তিটি সভ্য সমাজ হেয় বা অবজ্ঞার চোখে দেখে। তবে এরা চন্ডাল, চামার, মুচি, নাপিত এদের পোশাক ধৌত করণ করে না। অনেকের মতে এদের পূর্ব পুরুষ নেতা ধোপানী। আমরা মনসামঙ্গলে যে নেতা ধোপানীর উল্লেখ পাই তাকেই অনেকে তাদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করে। মনসামঙ্গল কাব্যে নেতা ধোপানীর বিশেষ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ রকমই সমাজের বহু জাতি রয়েছে যারা সমাজ বন্ধু হিসেবে কাজ করে অতি সামান্য অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবুও সমাজের উচ্চবর্ণরা নিম্নবর্গীয়দের অবজ্ঞা বা ঘৃণা করে থাকে। বর্তমান প্রতিযোগিতা মূলক অর্থনৈতিক সামাজ ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে বেশি ভাগ নিম্ন বর্গীয়রা নিযুক্ত রয়েছে দিনমজুরির উপর। তাদের মধ্যে ধোবা অন্যতম। বৈদিক যুগের যদিও ধোবারা বর্ণ বিভাজনঅনুযায়ী ব্রাহ্মণ, কায়স্থদেরই পোশাক পরিচ্ছদ ধৌতকরণ করত। সাধারণত তারা পার্শ্ববর্তী নদী পুকুর নালাতে বস্ত্র ধৌতকরন করে জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু বর্তমান যুগের তাদের জীবন ও জীবিকাতে বহু পরিবর্তন এসেছে।

কলু জাতি বিভিন্ন শস্যজাত দ্রব্য পেশায় করে তা থেকে তৈল নির্যাস বের করে জীবিকা নির্বাহ করতো। পূর্বে কাষ্ঠ ঘানিতে শস্য পেশায় করে তেল বের করত বলে তাদের তেলি জাতি বলেও অভিহিত করা হয়েছে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার "অভয়া মঙ্গলকাব্য" টিতে কলু বা তেলিদের জীবিকা সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে-'কলুরা নগরে পাতে ঘানি'বর্তমানে কৃষিকাজ, মুদিখানার দোকান, শস্য পেশায়, মাড়াই কল প্রভৃতি কর্মের মধ্য দিয়ে এদের সংসার নির্বাহ করে। সময়ের পরিবর্তনে সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবন ও জীবিকা রুহ পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রাচীন ভারতের শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য ও কলা শিল্পের প্রাচুর্য রয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে এক শ্রেণির মানুষ নান্দনিক সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা হলেন সূত্রধর বা ছুতোর। এরা মূলত নিজেদের বিশ্বকর্মার বংশধর মনে করে সে হিসেবে তাদের কুলদেবতাকে পূজা করে এবং সেই বিশেষ দিনটিতে তাদের ব্যবহার্য সাজ সরঞ্জাম, হাতিয়ার, তার নিকট আবেদন করে। বিভিন্ন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা বিভিন্ন মন্দির, স্থাপত্য -ভাস্কর্য ওঅংকন শিল্পকলার মধ্যে নিমজ্জিত রেখে জীবিকা নির্বাহ করতো। বিভিন্ন শিল্পীদের মধ্যেও এদের খ্যাতি ও সুনাম ছিল। তাদের সৃজণশীলতা নিদর্শন অজান্তা

গুহা মন্দির, সোমনাথ মন্দির, জগন্নাথ প্রস্তর নির্মিত বিশাল মন্দির এরকম আরো বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। লোকসংস্কৃতির পরিচয় বহনকারী' ধর্মমঙ্গলকাব্য 'টি ধর্মঠাকুর বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। একসময় উড়িষ্য, উৎকল বিস্তীর্ণ অঞ্চল মধ্যবর্তী স্থান মল্লভূমি নামে পরিচিত। ধর্মমঙ্গল কাব্য যে যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায় তা এই মল্লভূমিকেই নির্দেশ করে। মল্লভূমি বলতে বীরভূম ,বাঁকুড়া, মানভূম, মেদিনীপুর, মালদহের কিছু অংশকে মূলত বুঝিয়ে থাকে। এগুলো মূলত রাঢ় অঞ্চল। আর রাঢ় অঞ্চলের কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য 'ধর্মমঙ্গলকাব্যে'। তাই তাতে সেখানকার মানুষের জন-জীবনে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বহু পূর্বে মল্ল জাতিরাই সেই অঞ্চলের অধিকারী ছিল। তাই সেখানকার অধিবাসীদের বলা হত মাল বা মালো। এরা মূলত দ্রবিড় বংশজাত। তাই তাদের জীবন-জীবিকা, সংস্কার সংস্কৃতি সবই অনার্য প্রভাব পুষ্ট। মাল জাতি কিছুদিন মালদহে বসবাস করেছিল বলে সেই জাতির নাম অনুসারে মালদহে নামকরণ করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। মল্ল জাতিটির মধ্যে বহু শ্রেণিবিভাজন রয়েছে। বর্তমানে তারা সাপুরিয়া, বেদে, ধনিয়া, রাজবংশী,(পূর্বে কোচ নামেই সমধিক পরিচিত ছিল)। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য এই কয়টি জাতিকে তুলে ধরা হলো। এদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য সাপুরিয়া। এরা সর্প বিদ্যায় পারদর্শী। মন্ত্রবলে ও কৌশলের দ্বারা সর্প ধরা, সর্প নিয়ে খেলা দেখানো, বিষ সংগ্রহ করার মধ্যে দিয়ে কোনক্রমে যাযাবর জীবনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের কেউ কেউ বাদর খেলা দেখানো, মাদলি তাবিজ বিক্রি করে , ছোটখাটো যাদুবিদ্যার দেখানোর মধ্যে দিয়ে অনুন্নত পরিবেশে বসবাস করে। পরবর্তী সময়ে যারা এদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে তারা একটু আধটু কৃষি কাজ করতে আরম্ভ করে। বর্তমানেও এই জাতিটির বিশেষ কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হয়নি। এখনো অস্থায়ীভাবে গ্রামে-গঞ্জে বসবাস করে।

পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী মাল জাতিটি 'মাল পাহাড়ী' নামে পরিচিত। তারা নিম্নস্তরের জনজাতি। তাই তাদের জীবিকা দিনমজুর। বর্তমানে তারা চা বাগানের চা শ্রমিকের কাজ করে থাকে। তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা মুলক কাজ বেশি ঘটে। চুরি ডাকাতির মতো ঘৃণ্য অপরাধমূলক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তবে বর্তমানে তাদের জীবন শৈলীতে বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ,অঞ্চলে বসবাস রাজবংশী যারা বর্তমানে তফসিলভুক্ত হলেও অনেকে নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় বলে মনে করে থাকে। এর পিছনে অবশ্য পৌরাণিক কাহিনী লুকায়িত। পরশুরামে হাত থেকে রক্ষা পেতে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করে শুদ্রা বলে নিজেদের পরিচয় দেন এবং সেই থেকে তারা পতিত শূদ্র বলে কথিত। আবার অনেকে মনে করেন রাজবংশীরা প্রকৃতপক্ষে কোচ জনগোষ্ঠী। এরা ষোড়শ শতকের কোচ দলপতির দুই নাতি বিশু সিংহ ও শিশু সিংহ কোচরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেদের রাজবংশী বলে পরিচয় দেন। তাই বংশীয় ও কোচ উভয় উভয়ের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। অনেকের মতে কোচ জাতির সৃষ্টি শিবের থেকে তাই তারা নিজেদের শিবের বংশধর মনে করেন। তাদের পূর্বপুরুষ যদি হয় শিব হয় তাহলে সেও(শিব) কৃষি সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আবার কোচদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। শিবমঙ্গল বা শিবায়নে কোচ জাতির উল্লেখ রয়েছে। সেখানে দেখা গেছে কোচ রমণীদের ছলা-কলা। এ থেকে তৎকালীন সময়ে তাদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু টা অবগত হওয়া যায়। কিছু কোচ রমনী পুরুষকে প্রলুব্ধ করে ও জীবিকা নির্বাহ করতো। বর্ণগত দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে রাজবংশী মূলত ক্ষত্রিয় শ্রেণিবিভাগেরই একটি ভাগ। পূর্বে তারা ক্ষত্রিয় রাজবংশী বলে পরিচিত হতেন কিন্তু বর্তমানে

তারা অনুসূচিত জাতির মধ্যে অবস্থান করছে। তাদেরও প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। ধান কেটে গোলায় পূর্ণ করার পর তারা যোগী সন্ন্যাসী শিবের পূজা করে।পূজান্তে আবার প্রসাদ হিসাবে গন্জিকা সেবন করে।

আরেকটি বৃত্তিজীবী জনজাতির কথা না বলে জীবিকা সম্পর্কে বলাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তারা দেহ পসারিনী বৃত্তিজীবী বলে অভিহিত। পুরুষের আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করানোই তাদের পেশা। খাদ্য বস্ত্র অর্থাৎ অন্ন সংস্থানের জন্য সমাজের নিম্নবর্গীয় নারীরা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছার হোক বর্ণহিন্দুদের জৈবিক তৃষ্ণা মেটায়। চর্যাপদের নারীদের উল্লেখ পাই উচ্চশ্রেণির পুরুষের চাহিদা পূরণ করেছে।' চর্যাপদে'র ডোম নারীদের উল্লেখ পাই তারাও সমাজের উচ্চশ্রেণির পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করেছে। মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যেও তার উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ 'ধর্মমূল কাব্যে' সুরিক্ষা-গুরিক্ষা ও ভাজন বুড়ির চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ে দেহ বৃত্তিজীবিণীদের রূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গোলাঘাটের এই বৃত্তি জীবিনীদের রূপ চিত্র অঙ্কনে কবি লিখেছেন-

"লাস বেশ পান ফুলে সাজায়ে পসরা।
সহচরী সঙ্গে বসে ভিতর বাজরা।।"[১৬]

এছাড়াও 'শিবায়ন ' বা 'শিব মঙ্গলে 'কোচ রমণীদের এই বৃত্তির উল্লেখ রয়েছে। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে লম্পট পুরুষ, সৌখিন বর্ণহিন্দুদের প্রলুব্ধ করতে কালকেতুর নবনির্মিত রাজ্যে বারবধু গনের আগমন ঘটেছে।

"লম্পট পুরুষ আশে বারবধু বৈসে
এক ভিতে হইয়া অধিষ্ঠান।" [১৭]

চন্ডীমঙ্গল কাব্যে যেমন নিম্নবিত্তজীবী মানুষের চরিত্র চিত্রশালা তেমনি ধর্মমঙ্গল কাব্যও পিছিয়ে নেই সেখানে বিচিত্র মানুষের জীবন-জীবিকার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কর্মকার শ্রেণির প্রতিনিধি -বিশ্বকর্মা ও ধর্মদাস, বাজনাদার -হরিহর, বারুই- শিবা দত্ত, দেহ বৃত্তি জীবনী -সরিক্ষা, গুরিক্ষা, ভাজন বুড়ি, হাঁড়ি -ইছারানা, ডোম কালু, লাখাই, চন্ডক-লোহার বর্জ, গোপ-সোম ঘোষ, ইছাই ঘোষ তার প্রত্যেককেই নিজ নিজ পূর্বপুরুষের বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করেছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকে যাত্রা করে মধ্যযুগের পথ অতিক্রম করে বর্তমান যুগে যে সমস্ত জাতি ও উপজাতি নিজ নিজ পেশায় যুক্ত রয়েছে প্রাচীন কালেও সেই পেশায় নিযুক্ত ছিল। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক -অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি কারণে যুগগত পালাবদল ঘটায় অতীত যুগের জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা থেকে বর্তমান যুগের জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই নিম্নবর্গীয়দের জীবিকা গ্রহণ করারক্ষেত্রে এখন পূর্বের মত বাধ্যতামূলক নয় নিজ চাহিদাও ইচ্ছানুসারে বৃত্তি গ্রহণ করে থাকে। মধ্যযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত অস্পৃশ্য নিম্নবর্গীয়দের জীবিকার পরিবর্তন ঘটেছে তার মূলে রয়েছে শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক প্রসার, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং নিজ পূর্বপুরুষীয় ও বৃত্তির প্রতি ঐকান্তিক শ্রোদ্ধা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

(১) 'মনসামঙ্গল' কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সম্পাদক তন্ময় মিত্র, মীর রেজাউল করিম, প্রথম প্রকাশ ২১শে জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
(২) ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮।

(৩) ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'সম্পাদক জয়ীতা দত্ত, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ, অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা পৃষ্ঠা ১০৯, প্রকাশক রত্নাবলী।

(৪) কবিকঙ্কণ চণ্ডী সম্পাদনা সনৎ কুমার নস্কর, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, কালকেতুর বিবাহের অনুবন্ধ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৯, প্রকাশক রত্নাবলী।

(৫) ঐ 'কালকেতুর মৃগয়া' পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৯।

(৬) ঐ 'কালকেতু মৃগয়া' পৃষ্ঠা সংখ্যা১৮৯।

(৭) ঐ 'ধীবর প্রভৃতি অন্যান্য জাতির আগমন'পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৯।

(৮) রুপরাম চক্রবর্তী 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' 'জাগরণ পালা' পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩২, সম্পাদক অক্ষায় কুমার কয়াল, চতুর্থ মুদ্রন ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশক ভারবি।

(৯) 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, সম্পাদক সনৎকুমার নস্কর, পঞ্চম সংস্করণ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, 'ধীবর অন্যান্য জাতির আগমন', পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৯, প্রকাশক রত্নাবলী।

(১০) ঐ, পৃষ্টা সংখ্যা ২৯৯।

(১১) রূপরাম চক্রবর্তী 'ধর্মমঙ্গল কাব্য'সম্পাদক অক্ষয় কুমার কয়াল, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭, প্রকাশক ভারবি।

(১২) কবিকঙ্কণ চণ্ডী সম্পাদনা সনৎ কুমার নস্কর, পঞ্চম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, ধীবর প্রভৃতি অন্যান্য জাতির আগমন, প্রকাশনা বা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৯।

(১৩) ঐ, 'গোপ প্রভৃতি জাতির আগমন' পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৭।

(১৪) ঐ 'ধীবর প্রভৃতি অন্যান্য জাতির আগমন' পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৯।

(১৫) ঐ 'গোপ প্রভৃতি জাতির আগমন'পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৭ ।

(১৬) ঐ 'ধীবর প্রভৃতি অন্যান্য জাতির আগমন'পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৯।

(১৭) 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সম্পাদক সনৎ কুমার নস্কর, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৯, পঞ্চম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশক রত্নাবলী।

,